১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান
(কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে একই সাথে দাবি উত্থাপন)
ও
বিধানসভা অভিযান
জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ● বেলা ২টা

দুপুর ২টা – বিকেল ৪.৩০ মি.
জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ
ও
জেলা শাসককে স্মারকলিপির অনুলিপি প্রদান

১২ই জুলাই কমিটি

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

অষ্টম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২২ ■ ৫০তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান

সংগ্রামকে আরও ঐক্যবদ্ধ ও প্রসারিত কর

শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সাক্ষী রেখে জীবন জীবিকার লড়াইকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত করার প্রত্যয় ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের ধাত্রীভূমী

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে ২৪-২৬ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন।

আমরা চলি সমুখপানে, কে আমাদের বাঁধবে?

কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথমবার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি শহর তথা জলপাইগুড়ি জেলায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই, এই মহতী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিগত ১৫ মে ২০২২ জলপাইগুড়িতে গঠিত হয় তারুণ্যে ভরপুর এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি। রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ির কর্মচারী সমাজের অভ্যন্তরে যেমন জন্ম নিয়েছিল এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততা, তেমনি জেলার শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী সমাজ সহ ছাত্র-যুব-মহিলা গণসংগঠনগুলির অভ্যন্তরে তৈরি হওয়া আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছে সম্মেলনের দিনগুলিতে। ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ বিকালে প্রতিনিধিদের উদ্দীপ্ত মিছিল শহরের বুক চিরে অলি-গলিতে কর্মচারী সমাজ তথা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার দাবিগুলি নিয়ে স্লোগান তুলেছে, সাথে সাথে সেই স্লোগানে গলা মিলিয়েছেন জলপাইগুড়ির সংগ্রামী মানুষজন। ঐদিন জলপাইগুড়ি শহর তথা তরুন মজুমদার নগর নামাঙ্কিত সম্মেলনস্থলেই উদ্বোধিত হয় সত্যজিৎ রায় নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপনিটি,

নবনির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক
দেবব্রত রায়

উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রাক্তন সহসম্পাদক তথা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সম্মেলনস্থলেই তৈরি হয়েছিল দুটি প্রদর্শনী, প্রথমটি জন্মশতবর্ষে সত্যজিৎ রায়ের যুগান্তকারী সৃষ্টিকে স্মরণে রেখে, দ্বিতীয়টি তেভাগা আন্দোলনের ৭৫ বছরকে স্মরণে রেখে। সম্মেলন মঞ্চটি উৎসর্গ করা হয় সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড মলয় রায়ের নামে।

২৪ ডিসেম্বর ২০২২ সকাল ৯টার সময় রক্ত পতাকা উত্তোলন ও সংগঠনের সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ও ঐতিহ্য-পরম্পরার এক নবতম

উদ্বোধক হান্নান মোল্লা

সংযোজন ও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার শুরুতেই সমগ্র সম্মেলনকে তার ঈপ্সিত গতি দিতে সাহায্য করেছিল। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বের শুরুতেই সংগঠনের সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য্য ও অন্যতম সহসভাপতিদ্বয় মানস দাস ও গীতা দে-কে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তথা অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তমোজিৎ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার সহ সভাপতি হান্নান মোল্লা। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সাফল্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশ জুড়ে সাত শতাধিক কৃষক সংগঠনের গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও বর্তমানে সমগ্র দেশজুড়ে ফ্যাসিবাদী উগ্র দক্ষিণপন্থী সরকারের জনবিরোধী ও শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী কর্মসূচীর বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম-আন্দোলনের বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে আগামী ৫ এপ্রিল ২০২৩ দিল্লীতে শ্রমিক-কৃষক যৌথ অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের 'বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ'-এর মহাসচিব নিজামউদ্দীন পাটোয়ারী, ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল, সি আই টি ইউ নেতৃত্ব জিয়াউল আলম, ভেটেরিনারি এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ডাঃ দেবাশীষ সাহা, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের সভাপতি মুন্সি মোসারফ হোসেন, কে এম ডি এ-র নেতা গৌতম মজুমদার, কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অরূপ চ্যাটার্জী, স্টিয়ারিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক সংকেত চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির দেবাশীষ কুণ্ডু ও পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির পক্ষে অরিন্দম চক্রবর্তী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তির

বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক
বিজয় শঙ্কর সিংহ

পরে শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতেই প্রণব করের নেতৃত্বে পিকু ব্রহ্ম, মীনা সাহা, ঝিমলী দিকপতি, রুবী সিন্‌হা-কে নিয়ে গঠিত হয় মাইন্যুটস কমিটি। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের সাংগঠনিক তথ্য সংগ্রহ ও

প্রধান অতিথি কে. হেমলতা

পর্যালোচনার জন্যে বানী প্রসাদ ব্যানার্জী ও সুমন কান্তি নাগের যুগ্ম নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭ জনের ক্রেডেনশিয়াল কমিটি। এছাড়াও সম্মেলন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় স্টীয়ারিং কমিটি।

রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতেই যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন। বিগত সময়কালে সংগঠনের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ লিটন পাণ্ডে। প্রাথমিকভাবে ২৮টি দাবি সংবলিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম সহ সম্পাদক দেবব্রত রায় ও তাকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সহ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস, সংগঠনের গঠনতন্ত্রের উপর সংশোধনী ও সংযোজনীর উপর প্রস্তাব রাখেন যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও তাকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দপ্তর সম্পাদক অভিজিৎ বোস। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ সহ প্রস্তাবাবলীর উপর উপস্থিত ৬৯১ জন (পুরুষ ৬২২, মহিলা ৬৯ জন) প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতি ও জেলা / অঞ্চলের পক্ষ থেকে ৩ জন মহিলা প্রতিনিধি সহ ৬২ জন প্রতিনিধি তিন দিন ধরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় দিন অধিবেশনে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি সম্মেলনের বিশেষ অতিথি সুভাষ লাম্বা, এছাড়াও একই দিনে ১২ই জুলাই কমিটি-র পক্ষ থেকে অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে উপস্থিত সম্মেলনের প্রধান অতিথি ও সি

বিশেষ অতিথি সুভাষ লাম্বা

আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সভানেত্রী কে. হেমলতা। রাজ্য সম্মেলন চলাকালীন সম্মেলন মঞ্চে অভ্যর্থনা কমিটি প্রকাশিত একটি সংগ্রাম আন্দোলনের একটি ভিন্ন ধারার ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করেন বিশেষ অতিথি সুভাষ লাম্বা, এছাড়াও সম্মেলনের তৃতীয় দিন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন প্রধান অতিথি কে. হেমলতা। সম্মেলন চলাকালীন সম্মেলনের দিনগুলিতে প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন সময়ে গণসঙ্গীত পরিবেশনা করেন

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

সম্মেলনের সাফল্য পর্যবসিত হোক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আয়ুধে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন ২৪-২৬ ডিসেম্বর ২০২২ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে অভূতপূর্ব সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রথম জলপাইগুড়ি জেলাতে সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ২০০১ সালে মালদহে ত্রয়োদশ সম্মেলন এবং ২০০৭ সালে শিলিগুড়িতে পঞ্চদশ সম্মেলনের পর উত্তরবঙ্গের তৃতীয় জেলা হিসাবে জলপাইগুড়িতে সংগঠনের ২০তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ছোট জেলা, কর্মচারী সংখ্যাও কম তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এবং সার্বিক সাফল্যের সাথে এইরকম একটা সুবিশাল ব্যপ্তিসম্পন্ন সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনকে সম্পন্ন করার জন্য অবশ্যই জলপাইগুড়ি জেলার কর্মচারী, পেনশনার্স তথা জেলার সাধারণ মানুষের অবশ্যই অভিনন্দন প্রাপ্য।

অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভেদ করে এই সম্মেলন সফল হয়েছে। পূর্বে উত্তরবঙ্গে যে দুটি রাজ্য সম্মেলন হয়েছে অথবা আজ পর্যন্ত সংগঠিত সবক'টি সম্মেলনই সাফল্যের শীর্ষে গেছে নানা প্রতিকূলতাকে জয় করেই এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিস্থিতি বিচারের অন্যতম নিরিখ হল সময়। সেইদিক দিয়ে দেখলে উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠিত অতীতের দুটি সম্মেলনের সময়কাল বলছে যে, সেই সময় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিকূলতা বিরাজমান থাকলেও আমাদের রাজ্যে সেইসময় শ্রমিক-কর্মচারী বা মেহনতি মানুষের সংগ্রাম আন্দোলনের সহায়ক পরিস্থিতি ছিল। সেই সময় রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল বামফ্রন্ট সরকার। জলপাইগুড়িতে যে সময় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তখন রাজ্যে এমন একটা সরকার ক্ষমতায় যারা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক যে অধিকারগুলি কর্মচারী ও পেনশনার্সরা উপভোগ করে আসছিলেন সেগুলি কেড়ে নিতে উদ্যত। শুধু কর্মচারী নয় শ্রমজীবীদের অন্যান্য অংশও একইভাবে আক্রান্ত। রাজ্য পরিস্থিতির যে নেতিবাচক পরিবর্তন ২০১১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে তার প্রায় সাড়ে এগারো বছর পর বর্তমানে রাজ্য পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে আরও অনেক বেশি প্রতিকূল হয়েছে।

তাহলে প্রতিকূলতাকে ছিন্ন করে অতীতে কি আমরা কোনো সফল সম্মেলন করিনি? অবশ্যই করেছি। অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে এটা চাক্ষুষ করা যাবে যে কলকাতার ত্যাগরাজ্য হলে আমাদের সংগঠনের চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন হয়েছিল ১৯-২১ নভেম্বর, ১৯৭২ এবং ঐ ত্যাগরাজ হলেই আমরা পঞ্চম সম্মেলন করেছিলাম ২২-২৪ মার্চ, ১৯৭৫। সাল দুটি বলে দিচ্ছে সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে জারি ছিল আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস। সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসকে উড়িয়ে দিয়ে ঐ দুটি সম্মেলন ঐতিহাসিকভাবে সফল হয়েছিল। আবার ২০১১ সালে নতুন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার পর থেকে বিংশতিতম সম্মেলনে যাবার আগে ২০১৩-তে অশোকনগরে সপ্তদশ, ২০১৬-তে মুর্শিদাবাদে অষ্টাদশ এবং ২০১৯-এ বর্ধমানে উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছি। কোনো ভাবেই এই সম্মেলনগুলির সাফল্যকে খাটো করা যাবে না। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করে রাজ্য সম্মেলনকে সফল করা নতুন বিষয় নয়, বরং এই পরম্পরাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঐতিহ্য।

এতদ্‌সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতির জটিলতা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। গোটা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তি সহ অন্যান্য নানা ধরনের বিভাজনকারী শক্তি যেভাবে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করছে তা অভূতপূর্ব। সাম্প্রদায়িকতার বিপদ অতীতেও ছিল। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে এই ধরনের ভয়ঙ্কর শক্তিগুলি তাদের জমি মজবুত করার সহায়ক শাসককে পেয়েছে এই রাজ্যে। যা অতীতে কখনও ঘটেনি। শুধু ধর্মীয় বিভাজন নয়, জাতি, লিঙ্গ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদি ভিত্তিক বহুমাত্রিক বিভাজন সৃষ্টিকারী শক্তিগুলি আজ রাজ্যে সক্রিয়। জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে বিভাজনের শক্তিগুলি উত্তরোত্তর যেভাবে সক্রিয় হচ্ছে তা অতীতে আমরা দেখিনি। দেড় দশক ধরে চলা বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমশ সঙ্কটের গহ্বরে পতিত হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষ তীব্র সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। শ্রমজীবী মানুষ, সাধারণ মানুষের এই আশু সমাধানঅযোগ্য দুর্দশা জমি তৈরি করে দিয়েছে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থানের। গোটা বিশ্বজুড়ে এই মুহূর্তে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি, নিওফ্যাসিস্টদের দাপাদাপি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দেশেও ২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের পর থেকে আর এস এস-এর হিন্দুত্ববাদী কার্যকলাপ প্রবল মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আক্রমণ তীব্র রূপ নিয়েছে হিন্দুত্বের শক্তি ও কর্পোরেট শক্তি জোটবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে। হিন্দুত্ববাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদের আড়ালে চলছে অবাধে দেশ লুটের প্রক্রিয়ায় দেশের সংবিধান বর্ণিত 'গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র' সামগ্রিকভাবে আক্রমনের মুখে।

তাই বহুমাত্রিক প্রতিকূলতা যেগুলি অনেকক্ষেত্রেই অতীতের তুলনায় একেবারে নতুন। নতুন শুধু আমাদের রাজ্যে বা দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও—সেই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পূর্ণাঙ্গরূপে সফল হয়েছে। এই সাফল্যের সকল অংশীদারকে পুনরায় রক্তিম অভিবাদন।

আমাদের কাছে রাজ্য সম্মেলন বা যেকোনো স্তরের সম্মেলন হল সংগ্রামের মঞ্চ। কিন্তু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামের মঞ্চ অন্যান্য অংশের দাবি দাওয়াকে দূরে সরিয়ে রেখে সার্বিক সফলতা পেতে পারেনা। আমরা আমাদের নিজস্ব দাবি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব যেমন গ্রহণ করেছি, ঠিক তেমনি বৃহত্তম সমাজের অন্যান্য অংশের দাবি দাওয়াগুলিকেও যুক্ত করেছি। একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এই সম্মেলন গ্রহণ করেছে। আমাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করে যে সকল চুক্তিভুক্ত কর্মচারীরা, যারা কার্যত মধ্যযুগীয় শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট প্রতিনিয়ত, তাদের আলাদা সংগঠন গড়ে তুলতে আমরা উদ্যোগী হব। অতীতেও আমরা এদের সংগঠিত করাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছিলাম। আমরা অতীতে চুক্তিভুক্ত কর্মচারীরা যে ধরনের কাজ করে তার সমধরনের ক্যাডারর্ভুক্ত সমিতি তাদের সদস্যভুক্তি করবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। সেই সিদ্ধান্ত রূপায়নে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে সাফল্য আসলেও লক্ষ্যপূরণ হচ্ছিল না। তাদের দাবি দাওয়া, তাদের চাকরির নিরাপত্তা—কোনোকিছুই নিয়মিত কর্মচারীদের সাথে মেলে না। সেই প্রেক্ষিতেই এই অভিনব সিদ্ধান্ত। এর মধ্য দিয়ে আরও একটা নতুন চ্যালেঞ্জ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গ্রহণ করেছে। অসংগঠিত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সংগঠন গড়ে তুলে তাদের নিয়ে রাজ্যের বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামতে হবে। কারণ এদের সংখ্যা প্রশাসনে ক্রমবর্ধমান।

রাজ্য সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যৌথ আন্দোলনের যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা সম্মেলন পূর্ববর্তী সময়ে ছিলাম তাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং আরও প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যৌথ মঞ্চের আহ্বানে বিগত বছরের ৩০ আগস্ট ২ ঘণ্টার কর্মবিরতির কর্মসূচী, ২৩ নভেম্বর বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচীর সাফল্য যে জমি তৈরি করে দিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের কর্মচারীদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করে জোরদার সংগ্রামে নামানোর লক্ষ্যে যৌথ আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করতেই হবে। তাই আরও অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত এই সিদ্ধান্তটিও অত্যন্ত সময়োপযোগী।

শুরুর কথায় আবার ফিরে গিয়ে বলতে হয়, বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন বহিরঙ্গ ও অন্তর্বস্তুগত উভয়বিধ দিক দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে সফল। কিন্তু এই সাফল্য আনুষ্ঠানিক থেকে যাবে যদি না আমরা সম্মেলনে গৃহীত অত্যন্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্তগুলি সফলভাবে রূপায়ন না করতে পারি। জলপাইগুড়ি সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য আমাদের এই বর্ধিত দায়িত্ব অর্পন করেছে। □

৬ জানুয়ারি, ২০২৩

কমরেড সমর রায়

মালদহ জেলা তথা রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড সমর রায়-এর জীবনাবসান হয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ রাত ১টা ৩০ মিনিটে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারী হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসার জন্যই তাঁকে চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। জেলার সরকারী কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র বর্তমান।

কমরেড সমর রায়ের জন্ম ১৯৪২ সালে অধুনা বাংলাদেশে বগুড়া জেলায়। সেখানেই তাঁর পড়াশোনা শুরু। প্রাথমিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি পরিবারের সাথে মালদহ চলে আসেন এবং মালদহ কলেজে কমার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে স্নাতক হন। ১৯৬৬ সালে তিনি কৃষিকারিগরি বিভাগে করনিক পদে যোগদান করেন। শুরু থেকেই তিনি ডব্লু বি এম ও এ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ধীরে ধীরে তিনি সমিতির নেতৃত্বে উন্নীত হন। পরবর্তীতে তিনি মালদহ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক পদে আসীন হন। তিনি গণআন্দোলনে নিজেকে সরাসরি যুক্ত করার তাগিদে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই (এম) প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিজয়ী হয়ে বিধায়ক হন। সি পি আই (এম) পার্টির জেলা কমিটির সদস্য এবং ইংরেজবাজার জোনাল কমিটির সম্পাদক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার পাশাপাশি তিনি কর্মচারী আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থাকতেন।

চেন্নাই থেকে তাঁর মরদেহ বিমানে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বানীপ্রসাদ ব্যানার্জী এবং ডব্লু বি এম ও এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত ও সমিতির অপর নেতা মনোজ রক্ষিত। মরদেহ মালদহে নিয়ে যাওয়া হলে কর্মচারী ভবনে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক হিমাংশু দে, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুবীর রায়, জেলায় কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা নিরঞ্জন প্রামাণিক, ডব্লু বি এম ও এ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আখতার আলি, মুর্শিদাবাদ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় সাহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ছুটির দিন সত্ত্বেও কর্মচারী ভবনের সামনে প্রচুর সংখ্যক কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত হন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। প্রয়াত কমরেড সমর রায়ের ইচ্ছানুসারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে তাঁর মরদেহ মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করা হয়। □

শোক সংবাদ

কমরেড সুহাস মুখার্জী

বাঁকুড়া জেলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতা এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড সুহাস মুখার্জীর জীবনাবসান ঘটেছে। গত ২০ জানুয়ারি ২০২৩ স্থানীয় এক বেসরকারী হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

কমরেড সুহাস মুখার্জী ১৯৫৭ সালে সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজে যোগদানের পরেই বামপন্থী কর্মচারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে ডব্লু বি এম ও এ সংগঠনের জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাঁকুড়া জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক হন ১৯৭১ সালে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর তিনি ঐ পদে বহাল থেকে সংগঠনকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। ডব্লু বি এম ও এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবেও দায়িত্ব সামলেছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি গণআন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন।

১৯৭৪ সালে রেল ধর্মঘটের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঐ বছরই ৯ এপ্রিল ধর্মঘটে অংশ নেবার কারণে তাঁর বেতন কেটে একদিনের চাকরি বিচ্ছেদ করা হয়। সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ হিসেবেও তিনি দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন। জেলার কর্মচারীদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনবদ্য। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে কর্মচারী সমাজে।

হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ সংগঠন দপ্তরে আনা হলে শেষ শ্রদ্ধা জানান জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মনোজ ব্যানার্জী, জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতৃত্ব প্রণব মুখার্জী, পার্থ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রয়াত কমরেড সুহাস মুখার্জীর ইচ্ছানুসারে তাঁর মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করা হয়েছে। □

কমরেড ব্রজগোপাল ভৌমিক

১৯৮৬ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২৪ পরগণা জেলা ভাগ হওয়ার পর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রথম সম্পাদক কমরেড ব্রজগোপাল ভৌমিক ৮৬ বছর বয়সে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ প্রয়াত হয়েছেন। আমৃত্যু শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শে বিশ্বাসী কমরেড ভৌমিক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, ২৪ পরগনা জেলায় সমিতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও অবসর পরবর্তীতে রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর।

স্বাধীনতার পর দেশভাগ পরবর্তীতে কমরেড ভৌমিক অবিভক্ত বাংলার ঢাকার আশানুল্লা পলিটেকনিক কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা করে রায়গঞ্জে চলে আসেন এবং গ্রামীণ আবাস প্রকল্পে অবর সহ বাস্তুকার পদে যোগ দেন। ষাটের দশক থেকেই উনি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সত্তরের দশকে আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের সময় রায়গঞ্জে অন্যান্যদের সাথে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। জরুরি অবস্থায় সংগঠন করার জন্য তাকে বেশ কয়েকবার বদলি হতে হয়। ১৯৭৪ সালে উনি অবিভক্ত ২৪ পরগণার গাইঘাটা ব্লকে বদলি হয়ে আসেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর দু'বারই ওনার বাড়ি দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু উনি এলাকার মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ করেন। কর্মচারী দরদী অমায়িক কমরেড ভৌমিক ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, উনি স্বীয় বাসভবনে নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলেন এক মূল্যবান গ্রন্থাগার। কমরেড ব্রজগোপাল ভৌমিকের স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই সাথে সাথে তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র সহ পরিবার পরিজনদের জানাই গভীর সমবেদনা। □

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পত্রিকার পরিসরজনিত এবং অন্যান্য কিছু অনিবার্য কারণে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের সকল ছবি এবং সম্পূর্ণ রিপোর্ট এই সংখ্যায় মুদ্রণ করা যায়নি। আগামী সংখ্যায় অন্যান্য ছবি এবং রাজ্য সম্মেলন সংক্রান্ত আরও রিপোর্ট প্রকাশিত হবে।—সম্পাদকমণ্ডলী

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের বার্তা

আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিরোধই একমাত্র পথ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

আন্দোলন-সংগ্রাম-ঐতিহ্যের বহমান ধারায় সংগঠনের বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন সমাপ্ত করে এসেছি। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে সমাজ উত্তরণের কালপর্বে আন্দোলন সংগ্রামে কর্মচারী সমাজের ভূমিকা বারে বারে প্রমাণিত। যদিও সরকারী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠার শুরু থেকে দেশি-বিদেশী উভয় শাসকের অধীনে কর্মরত কর্মচারী হিসেবে রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন সময় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়বিধ ভূমিকা সকলেরই জানা। দেশি-বিদেশী শাসক বা রাজ অনুগ্রহের সুবিধা ভোগ, আবার বিপরীত মেরুতে অবস্থান গ্রহণের জন্য রাজরোষের মুখোমুখি হয়েছেন কর্মচারীরা। যতদিন রাজন্যবর্গ বা প্রশাসকের স্বার্থরক্ষা হয়েছে ততদিন রাজকর্মচারীকে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন স্বার্থ ফুরিয়েছে বা স্বার্থের বিঘ্ন ঘটেছে কর্মচারীকে আক্রমণ করা হয়েছে—এমন বহু ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বর্তমান প্রজন্মের বহু কর্মচারীর জীবনেও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও ঘটে চলেছে। এই বিভ্রান্তিকর উপাদানের সম্মুখীন হয়ে কিছু অংশের কর্মচারী নিজের অবস্থান স্থির করতে দ্বিধাগ্রস্থ। উল্টোদিকে আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারী লড়াই জারি রেখেছেন।

দেশের শ্রমজীবী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ। সমাজ দর্শনের অমোঘ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেতনায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে সংগঠনের প্রতিটি কাঠামোর মধ্য থেকে। সেই লক্ষ্যে ব্লক স্তর থেকে ধাপে ধাপে কাঠামো পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে। ২৩-২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ চারদিন রাজ্য সম্মেলনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জলপাইগুড়ি শহরে রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সাত শতাধিক প্রতিনিধি। আমাদের সংগঠনের কাছে সম্মেলন সংগ্রামের মঞ্চ। আর আমাদের অপরাপর অংশের খেটে খাওয়া মানুষের থেকে 'বিচ্ছিন্ন নয়', 'একাত্মতা' হল এই সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু কোনো স্বয়ংক্রিয় শক্তি এই একাত্মতাকে গড়ে তুলতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রতিদিন চাক্ষুষ করা অপরাপর অংশের মেহনতী মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সামাজিক টানাপোড়েন ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে উপলব্ধি করা ও আত্মস্থ করা। এই প্রক্রিয়ায় যে আত্মপ্রত্যয়ের ভিত নির্মিত হয়, তাতে আবেগের প্রলেপ দেয় ইতিহাসে স্থান পাওয়া সংগঠনের ঘটনাবলী এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষের কর্মকাণ্ড।

২৪ ডিসেম্বর, ২০২২ সকাল থেকে সম্মেলনের মূল কর্মকাণ্ড শুরু হলেও তার আগে জুলাই মাস থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় সম্মেলনকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে আবৃত করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। ফলে ২০তম রাজ্য সম্মেলন যেন তাঁদেরও সম্মেলন, এমন উষ্ণতা নিয়েই জলপাইগুড়ির আপামর সাধারণ জনগণ এই সম্মেলনকে গ্রহণ করেন। কর্মচারী ও সাধারণ জনগণের নৈকট্য এই সম্মেলনের অতিরিক্ত প্রাপ্তি।

রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আলোচনাতেও কর্মচারী সহ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ওপর নেমে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। সম্মেলনে সামগ্রিক আলোচনার নির্যাস হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুসরণ করে বিভিন্ন জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের সরকার যেমন রাষ্ট্রের অধীনে থাকা সমস্ত সম্পদ বেচে দিতে চাইছে, তেমনি রাজ্য সরকারও বিভিন্ন সরকারী সম্পত্তি ও জমি প্রমোটারচক্রের হাতে তুলে দিতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে, আর রাজ্য সরকার সেই বিভাজন থেকে পরোক্ষে ফায়দা লুঠতে চাইছে। রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি নিয়ে আদালত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার ফলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মাঠে নামতে বাধ্য হলেও, কোনো এক অদৃশ্য সুতোর টানে তাঁদের তৎপরতা মাঝে মাঝেই ঢিমে গতিতে চলছে। প্রশাসনে বিপুল শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী শূন্যপদে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে স্বল্প বেতনে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও অস্বচ্ছতার প্রতিফলন ঘটছে। বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত উপেক্ষার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে রাজ্য সম্মেলন।

সরকারী কর্মচারীদের ওপর শোষণ, বঞ্চনা, দমন-পীড়নের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। তবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটবে না। সম্মিলিত শক্তি দিয়েই তা করতে হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সংগঠিত-অসংগঠিত অংশের শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের ক্ষেত্র আলাদা কিন্তু অভিমুখ অভিন্ন। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই-আন্দোলনে বিভ্রান্তির বীজ বপন করতে তাদের খণ্ড খণ্ড রূপ দিতে চাইছে কর্পোরেটমুখী দক্ষিণপন্থী শক্তি। বর্তমান সময়ে আক্রমণের বহুমাত্রিকতার মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমা চলছে। আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে পুঁজিবাদ বেপরোয়া। ফলে লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার হরণ করে মুনাফাকে স্ফীত করছে। আরও মুনাফার লোভে রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকাকে খর্ব করা হচ্ছে। নিয়মিত সংগঠিত অংশের পরিবর্তে চুক্তি-এজেন্সী-আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে কাজ চলছে। বল্গাহীন শোষণকে মসৃণ করতে একতরফাভাবে শ্রমিক স্বার্থে সৃষ্ট শ্রম আইনকে বাতিল করে শ্রমকোডের আওতায় আনা হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে যাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সোচ্চারিত হওয়ার কথা তাদের একাংশ সাময়িক বিভ্রান্তিতে বিশ্বায়িত ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে উঠছে। কেউ কেউ শ্রেণি অবস্থানকে ভুলে গিয়ে সমঝোতা করতেই অভ্যস্ত। একদিকে উগ্র দক্ষিণপন্থী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা জনমোহিনী শ্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় প্রচারের মুখোশে মুখ ঢেকে উন্নয়নের মেকি তত্ত্ব তৈরি করে বেড়াচ্ছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা রাজ্যে শক্তিবৃদ্ধি করতে সবরকম সহায়তা পাচ্ছে। স্বভাবতই শ্রমজীবীদের আন্দোলন মুখরিত সংহতি আজ আক্রান্ত। কিন্তু আন্দোলন-সংগ্রামের বাস্তবতা হারিয়ে যায়নি। বরং অনেক বেশি সম্ভাবনা প্রতিদিন বিকশিত হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে লড়াই-আন্দোলনের নতুন নতুন ক্ষেত্র। নির্দিষ্ট দাবিতে তৈরি হওয়া যৌথ মঞ্চের আহ্বানে সফল কর্মসূচী জনমানসকে নাড়া দিতে পেরেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাফল্যকে ধারণ করে আরও বৃহত্তর সংগ্রামে যাওয়ার চাহিদা ব্যক্ত হয়েছে প্রতিনিধিদের আলোচনায়। হিংস্র আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে সংহত করতে চাই ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর শক্তি। সম্মিলিত শক্তিই পারে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। সেইমত, যৌথ মঞ্চের পরিধিকে প্রসারিত করে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো বৃহত্তর সংগ্রামে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন।

রাজ্য প্রশাসনের অধিকাংশ কর্মচারী অস্থায়ী। স্বল্প বেতনে বেপরোয়াভাবে আংশিক ও অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই অংশের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ও অধিকারগত বঞ্চনার বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবি অর্জনে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীর মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করতে নানান কৌশল গ্রহণে মরিয়া শাসক শ্রেণি। তাই অপকৌশলকে ছিন্ন করার দায়িত্ব শুধুমাত্র অসংগঠিত কর্মচারীদের নয়। সংগঠিত অংশেরও সমান দায়িত্ব তাদের সংগঠিত হতে সহায়তা করা। বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের সংগ্রামী সহযোদ্ধা তৈরির যে দায়িত্ব অর্পণ করছে তা বাস্তবায়িত করতে সর্বত্র উদ্যোগ প্রয়োজন।

বঞ্চনা আর অবজ্ঞার অবসানে কোনো ধরনের হুমকি বা ভয়ের কাছে মাথা নত না করে দাবি আদায়ে প্রয়োজনে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে রাজ্য সম্মেলন। এই প্রত্যয়কে কার্যকরী করতে লড়াইয়ের মনোবলকে বৃদ্ধি করতে হবে ও কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। প্রতিবাদের ভাষাকে প্রতিরোধে উন্নীত করেই গণতন্ত্রকে রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতার ঐক্যকে রক্ষা সর্বোপরি জীবন-জীবিকার উপর অসহনীয় আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব। এই লড়াই একা ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমষ্টির। কর্মচারীদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন-সংগ্রামে শামিল করার মাধ্যমেই তা সম্ভব। বর্তমানে কর্মচারীদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নে শূন্যপদজনিত সমস্যার কারণে এবং কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আগের পরিস্থিতি নেই। এর থেকে উত্তরণ ঘটাতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে নিজের কর্মীসত্ত্বাকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মচারীর সামনে হাজির হতে হবে। বিশ্বায়নের আক্রমণ সর্বগ্রাসী। আজকে তার বিভিন্ন রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে। এই সমস্ত প্রশ্নে প্রতিনিয়ত নিজেকে জাগ্রত রেখেই বিনম্রভাবে সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে। ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর শোনাই শুধু কাজ নয়, প্রাপ্ত অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মচারীকে দিশা দেখানো। কাজের পূর্ণতা পাবে তখনই, যখন সমস্ত ভয়ভীতি, সংশয় কাটিয়ে কর্মচারীদের সহমতে আনা যাবে। আবার সহমতে আনা কর্মচারীদের আন্দোলনের রাস্তায় নামানো যাবে। এটা সম্ভব যদি আমি নিজেই প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করে কর্মচারীর কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য তৈরি করতে পারি—যার চেষ্টায় হাজার হাজার কর্মী নেতৃত্ব সচেষ্ট রয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষকদের যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে দেশ ও রাজ্যের পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী যৌথ দাবি সনদের ভিত্তিতে বিধানসভা অভিযান ও রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের দাবির সাথে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবিকে সম্পৃক্ত করে এই আন্দোলনের কর্মসূচীকে ঐতিহাসিক আন্দোলনের রূপ প্রদানের লক্ষ্যেই আমাদের সক্রিয় হতে হবে।

স্মরণে রাখা প্রয়োজন অধিকার অর্জনের জন্য একটি বা দুটি কর্মচসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে লাগাতার কর্মসূচীর মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রেণি সংগ্রাম হল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। যা সবসময় সরলরেখা ধরে চলে না। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে সম্ভাবনার বীজ। স্বৈরাচারীরা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে স্বেচ্ছাচার ডেকে আনে যা ইতিহাসে বারে বারে প্রমাণিত। স্বৈরাচারের লক্ষ্য হল নিজের স্বার্থে বিরোধীদের দমন করতে ক্রমশ আরও স্বৈরাচারী হতে হয়। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও আস্তে আস্তে দাঁত, নখ নিয়ে প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত উপাঙ্গকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্র বড়ই নির্মম, সে তার পথ বের করে নেয়। তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিরোধের জন্য মাথা আমাদের তুলতেই হবে। পরিবার-পরিজনসহ কর্মচারী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে রাজ্য সম্মেলন দিক নির্দেশ করেছে। আসন্ন পঞ্চায়েত স্তরের রাজনৈতিক সংগ্রামে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে যথাযথ ভূমিকা পালনে আসুন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। □

১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান
(কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে একই সাথে দাবি উত্থাপন)
ও
বিধানসভা অভিযান
জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, বেলা ২টা
বেলা ২টা—বিকেল ৪.৩০ মি.
জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ
ও
জেলা শাসককে স্মারকলিপির অনুলিপি প্রদান

দাবি সনদ

রাজ্য সরকারের কাছে ঃ □ কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া সহ ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। □ সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। □ অনিয়মিত / অস্থায়ী কর্মচারী ও শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। □ পঞ্চায়েতের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারী সহ রাজ্যের কর্মচারী ও শিক্ষকদের ওপর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। □ প্রতিহিংসামূলক নীতিহীন সমস্ত বদলির আদেশনামা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। □ ধর্মঘটের অধিকার সহ অর্জিত পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করা চলবে না। □ নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সমস্ত ধরনের অপরাধরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। □ যোগ্যতাসম্পন্ন অপেক্ষমান প্রার্থীদের শিক্ষক পদে যোগদান সুনিশ্চিত করতে হবে। □ মিড ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। □ রাজ্যে গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুনিশ্চিত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঃ □ নয়া পেনশন ব্যবস্থা (এম পি এস) বাতিল করে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা (ও পি এস) পুনরায় চালু করতে হবে। □ কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ করা চলবে না। □ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদগুলিতে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। □ অনিয়মিত / অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। □ GDS'দের বিভাগীয়করণ ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। □ অবিলম্বে অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করতে হবে। □ ১৮ মাসের বকেয়া ডি.এ / ডি.আর অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। □ পেট্রোপণ্য, খাদ্যশস্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে। □ পোস্ট অফিস সহ স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে সুদের হার হ্রাস করা চলবে না। □ জিপিএফ-এ জমানোর ৫ লাখ টাকার ঊর্ধ্বসীমা বাতিল করতে হবে। □ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা অটোনোমাস সংস্থার কর্মচারীদের দিতে হবে। □ ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, প্রতিরক্ষা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নিকরণ করা চলবে না। □ নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে। □ বীমার প্রিমিয়ামের ওপর থেকে জি এস টি প্রত্যাহার করতে হবে। □ বীমায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আয়কর আইনের ছাড়ের সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে। □ অতিমারি ও লকডাউনের কারণে স্থায়ীভাবে কর্মচ্যুত পরিবারগুলিকে মাসিক নগদ অর্থ সাহায্য করতে হবে। □ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বিনষ্ট করা চলবে না।

রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধকের বক্তব্য

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে স্বৈরাচারী সরকারকে নতজানু করতে

হান্নান মোল্লা
সহ সভাপতি, সারা ভারত কৃষক সভা

বিংশতিতম সম্মেলনের নেতা, বিশেষ অতিথি সর্বভারতীয় নেতা সুভাষ লাম্বাজী, বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারীদের নেতা এবং তাঁর সহকর্মী, অন্যান্য কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, যাঁরা মঞ্চে উপবিষ্ট এবং সেই সঙ্গে এই সম্মেলনে আগত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আমার প্রিয় প্রতিনিধি বন্ধুগণ।

আজকে একটা বিশেষ বাঁকের মুখে আপনারা মিলিত হয়েছেন এই সম্মেলনে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অনেকগুলি বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং আপনাদের সম্পাদকীয় রিপোর্টে অত্যন্ত সুচারু ভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। খুবই শিক্ষামূলক, ইনফরমেটিভ এবং ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট দেখলাম, যার উপর আপনারা আলোচনা করবেন এবং তার ভিত্তিতেই আগামী দিনে লড়ার পথ নিশ্চয়ই আপনারা গ্রহণ করবেন।

আজকে আমরা যখন এই সম্মেলনে মিলিত হয়েছি, তখন গোটা বিশ্বব্যাপী আমরা দেখছি যে রাজনৈতিক দক্ষিণ-পন্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনীতির রাইট উইং শিফট হয়েছে ইউরোপে, আমেরিকায়, এশিয়ায় এমনকি আমাদের ভারতবর্ষেও। সব জায়গাতেই একটা দক্ষিণপন্থী ঝোঁক ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের দেশের এবং দুনিয়ার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের সামনে এটা হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে সঙ্গে যে আক্রমণ— গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ওপর আক্রমণ, সুস্থ মিশ্র সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ—গোটা দুনিয়াব্যাপী যে এই ধরনের আক্রমণ শুরু হয়েছে, নিশ্চয়ই করে এটাও একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। তবে পাশাপাশি আমাদের নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠছে সর্বত্র। ইউরোপে প্রতিরোধ হচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকা প্রতিরোধের সামনে সারিতে এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রতিরোধের অসংখ্য চিত্র এবং সংগ্রামী ছবি প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্যে একদিকে যেমন আক্রমণের বীভৎসতা আছে, তেমনি অন্য দিকে প্রতিরোধেরও বিকাশ হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে আশার দিক। আমরা মনে করি, যেটা বিকশিত হয়, পরবর্তী কালে সেটাই শক্তি সঞ্চয় করে। কম হলেও এখন প্রতিরোধ বিকাশমান এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি শক্তিশালী হলেও তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে, মানুষ তৈরি হচ্ছে। এই লড়াইয়ে আমাদের কি ভূমিকা হবে, এখানে তা নিশ্চয়ই আপনারা আলোচনা করবেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আমরা বলছি একটা দক্ষিণপন্থী, ফ্যাসিবাদী, সাম্প্রদায়িক, মনুবাদী এবং কর্পোরেটপন্থী সরকার চলছে। স্বাধীনতার পর পঁচাত্তর বছরে এতো বেশি একটা প্রতিক্রিয়ার সরকার, এতো বেশি শ্রমিক বিরোধী সরকার, এতো বেশি ঐক্য বিরোধী সরকার, এতো বেশি সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নকারী সরকার, এতো বেশি সংস্কৃতিকে ধ্বংসকারী সরকার, এতো বেশি সাম্রাজ্যবাদের দালালি করা সরকার আমাদের দেশে আসেনি। সরকারি চরিত্রের বিশ্লেষণ আমরা করেছি আগেও, আপনারাও করেছেন, কিন্তু আজকের সরকারের চরিত্র আগের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার সরকারকে অতিক্রম করে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে গেছে। আজ এখানে রাজনীতি, অর্থনীতি, সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ডবলু টি ও-র নির্দেশ অনুযায়ী। এই কেন্দ্রগুলো যে নীতি নির্ধারণ করছে, সেই নীতিকে কেন্দ্র করেই আজকে পুঁজিপতিরা এখানে তাদের শক্তি সঞ্চয় করছে।

ফিনান্স ক্যাপিটাল আগে যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, আজকে কিন্তু তা সেই জায়গায় নেই। আজকে তা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। আজকে তার এতো বেশি শক্তি যে সে সমস্ত দেশের সীমা ভেঙ্গে দিয়েছে। সর্বত্র তার অবাধ গতি এবং সেই ফিনান্স ক্যাপিটালের যে বিস্তার, তাকে কার্যকরী করার জন্যে এই বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে এবং আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশ, যারা পশ্চিমী চিন্তায় প্রভাবিত, তারা বিশ্বব্যাংকের এই নীতিগুলিকে নিজের নিজের দেশে কিভাবে কার্যকরী করতে হবে, তার ফর্মুলা তৈরি করছে। সে জন্যে আমাদের দেশের ভিতরেও এর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম, জীবন-জীবীকার সংগ্রাম, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিজস্ব পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই।

আজকে যে পরিস্থিতিতে আমরা সম্মেলন করছি, তখন দেখছি যে ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে কৃষিতে, শিল্পে—সর্বত্রই নব উদারবাদী নীতি শক্তিশালী হয়ে প্রায় ক্ষমতা দখল করেছে। এই নব উদারবাদী নীতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফিনান্স ক্যাপিটালের রাজনৈতিক প্রতিভূ এবং সেই সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় হচ্ছে, তা নব উদারবাদী নীতিরই ফল, যার জন্যে মানুষের মন থেকে সমষ্টিগত চিন্তা খতম হয়ে গিয়ে ব্যক্তি চিন্তা, ব্যক্তি স্বার্থ বাড়ছে। আমরা বলছি তরুণ সম্প্রদায় শুধু নিজের স্বার্থের কথাই ভাবছে। মানুষকে শুধু নিজের কথা ভাবতে শেখানোই তাদের লক্ষ্য। আগেও মানুষ নিজের কথা ভাবতো, কিন্তু আজ যে সেটা তীব্রভাবে ভাবছে, সেটা হচ্ছে নব উদারবাদী নীতির সংস্কৃতি। নব উদারবাদী রাজনীতি হচ্ছে একাধারে ফ্যাসিবাদী এবং গণতন্ত্র বিরোধী রাজনীতি। তার সংস্কৃতি হচ্ছে চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং সামাজিক চিন্তার বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক ঐক্য, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনাকে খতম করার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই রাজনীতি বা সংস্কৃতি পরিচালিত হচ্ছে।

এই সমস্ত বিষয়গুলোই দেখলাম আপনাদের রিপোর্টে খুব সুন্দর করে লেখা আছে। আপনারা নিশ্চয়ই এর ভিত্তিতে শত্রুদের চিহ্নিত করতে পারবেন কারণ শত্রু চিহ্নিত করা আগে দরকার। শত্রু চিহ্নিত করেই লড়াইয়ের পথ নিশ্চয়ই আপনাদের সম্মেলন থেকে বেরোবে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নব উদারবাদী নীতিকে কার্যকর করার জন্যে যে রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, সেই রাজনীতি কিন্তু আর এস এস, সঙ্ঘ পরিবারের রাজনীতি। এই আর এস এস, সঙ্ঘ পরিবারের রাজনীতি ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে। কিভাবে সেটা হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমাদের জীবন-জীবিকা এবং আমাদের জীবন ধারা সব কিছুকেই তা ক্রমশঃ গ্রাস করছে এবং অনেক ঘটনা আপনারা দেখছেন।

কিভাবে শুরু হল---দেখুন অন্তত পঞ্চাশটা ঘটনা এই কয় বছরে—দু মাস, চার মাস অন্তর ঘটানোর মধ্যে দিয়ে নতুন ধরনের আক্রমণ আমাদের ওপর নামিয়ে আনা হচ্ছে। প্রথমে রাম জন্মভূমির ক্যাম্পেইন হল, তার থেকে বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। এমন ঘটনা কিন্তু ঘটেই যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ঘটনার নেতিবাচক ছাপ মানুষের মনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্যে (হিন্দু আর হিন্দুত্ব এক না, হিন্দু হচ্ছে আমাদের দেশে ধর্ম আর হিন্দুত্ব হচ্ছে সেই ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি, আর এস এসের যে দর্শন, তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য এই কাজগুলো করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু মানুষের মনে বিষকে শক্তিশালী করছে। তারপরে এলো কমিউনাল রায়ট বিভিন্ন জায়গায়। তারপরে মুম্বাইয়ের রায়ট হল। ঘটনাগুলো দেখবেন পর পর লেগে থাকে। তিন মাস, ছয় মাস ছাড়া ছাড়া এমন একটা ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, যা আগের থেকে আরও বেশি করে মানুষের মনে বিভেদকে প্রতিষ্ঠা করছে।

অযোধ্যা গেল, তারপর ধরুন শাহবানু মামলা হল। মানুষের মনে বিষ ঢুকে গেল। বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর আমরা দেখলাম বিজেপি ৯৮-৯৯ এর নির্বাচনে জিতল। অর্থাৎ তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আস্তে আস্তে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করলো। তারপরে গুজরাটে রায়ট হল। তারপরে গোটা ভারতবর্ষেই সাম্প্রদায়িকতাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করলো। বাজপেয়ীর সময়ে এতো তীব্র না হলেও তখন পরিকল্পিত ভাবে আদবানির নেতৃত্বে এই সাম্প্রদায়িক ভাঙ্গাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। তারপরে আপনারা দেখেছেন মালিগাঁও রায়ট হয়েছে, তারপরে বিভিন্ন এক্সপ্রেসে আক্রমণ—প্রত্যেকটা ঘটনাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক ঘৃণাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা মানুষকে আর একটা মানুষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এটা তৈরি করা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট গ্যাপে। মানুষ পুরনোটা হজম করতে না করতেই আর একটা নতুন ঘটনাকে হাজির করা হচ্ছে। আপনারা প্রজ্ঞা ঠাকুরের ভূমিকা দেখেছেন। তারপরেই মুজফফর নগরের রায়ট হল। তারপর দাভোলকর ইত্যাদির মতো বৈজ্ঞানিক চিন্তার মানুষ, বুদ্ধিজীবীরা খুন হতে থাকলেন। এই ভাবে আমরা দেখলাম একটা সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া তৈরি করা হতে থাকলো।

এরপর মোদি সরকার এলো। অন্ধকারের যুগ শুরু হল। এ একসাথে জনবিরোধী, প্রো-কর্পোরেট, ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা। এখন বুদ্ধিজীবীদের বলা হচ্ছে মাওবাদী, তাদের জেলে পোরা হচ্ছে। স্ট্যান স্বামী তো মারাই গেলেন। রাষ্ট্রীয় যে জঙ্গিবাদ আমরা দেখছি, সেটাই হল আর এস এসের দর্শন। কাশ্মীরকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। তারপর ৩৭০ এবং ৩৫ (ক) ধারা বাতিল করে দেওয়া হল। রাজ্য হিসাবে কাশ্মীরের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দেওয়া হল। এগুলো সবই গোটা দেশের মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। এই প্রতিক্রিয়া একদিকে যেমন সংখ্যা লঘু মানুষের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করছে, তেমনই সাম্প্রদায়িক শক্তির উৎসাহ বাড়াচ্ছে, তারা ক্ষমতার অলিন্দে চলে যাচ্ছে।

সরকারের বাইরে আর এস এসের থাকা আর সরকারের ভিতরে আর এস এসের থাকা—এই যে গুণগত পার্থক্য, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। আর এসে এস এখন সরকারের সমস্ত অলিতে গলিতে ঢুকে গেছে। পৃথিবীর কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকতা হয় না, কিন্তু এখানে নাগরিকতা আইন হল। এরপর শুরু হল রাম মন্দিরের নির্মাণ। বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও এরা ঢুকে পড়েছে। রাম মন্দির নিয়ে রায় দেওয়ার সময়ে খেয়াল করবেন, এক, দুই, তিন চার করে যখন রায়ের গ্রাউন্ড ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তখন সবগুলোই ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিন্তু যখন জাজমেন্ট দেওয়া হল, তখন বলা হল রামমন্দির হবে! অর্থাৎ কনটেন্ট বলছে হবে না, কিন্তু জাজমেন্ট বলছে হবে। ন্যায় পিছু হঠে গেল।

এখন আবার শুরু হয়েছে কাশি-মথুরা। এটা নিয়ে আরও তীব্র সাম্প্রদায়িকতা চলবে। সব হিন্দু পালনীয়গুলিকে সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ারে পরিণত করা হচ্ছে। সাধারণ নাগরিকদের যারাই একটু প্রতিবাদ করতে চাইছে, তাদেরই কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হচ্ছে, দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশ বিরোধী বলে। রাষ্ট্র এখন অন্যায়কারীদের সুরক্ষা দিচ্ছে। সমস্ত জরুরী বিষয়গুলি কোর্টে পড়ে থাকছে, কিন্তু প্রায়োরিটি পাচ্ছে বিভেদের বিষয়গুলি। এ জিনিস আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি পাবে, অন্যায় আরও হতে থাকবে। সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয় এবং এখন দিচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে খুব খারাপ জায়গায় দেশকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আম্বেদকরকে অস্বীকার করে মনুবাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে পরিকল্পিত ভাবে। নির্বাচন কমিশনকেও মেরুদণ্ডহীন করে দেওয়া হচ্ছে।

একে যদি প্রতিরোধ করতে না পারি, আমরা কোথায় যাবো? এ সবই নব উদারবাদী নীতির ফল। এ নীতি বলে, সরকারের কোনও কাজ থাকবে না ডাণ্ডা চালানো ছাড়া। সব কিছু হবে প্রাইভেট। এখানে তিরিশ বছরের নীচে কোনও ডেলিগেট নেই একই কারণে। সমস্ত রিক্রুটমেন্ট বন্ধ। তাহলে নতুন কর্মী আসবে কোথা থেকে? সব কন্ট্রাক্টে—স্থায়ী হবে না আর। সেই কারণে তাদের জোরও থাকছে না। সারা পৃথিবীতেই তাই হচ্ছে। ইউনিয়নের চেষ্টা হচ্ছে। কি হবে, সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এদের পিছুই হঠতে হচ্ছে।

উপভোক্তাদের ছেড়ে এখন উৎপাদক শ্রেণীকে আক্রমণ করা হচ্ছে। শ্রমিকরা উৎপাদক, কৃষকেরা উৎপাদক, ক্ষেত মজুররা উৎপাদক। সবাই আক্রান্ত। এই আক্রমণের বিরুদ্ধেই আমরা লড়াই করার চেষ্টা করছি। কৃষিতে সমস্যা ছিল। ভূমি সংস্কার না হওয়ার ফলে কৃষিতে সমস্যা স্বাধীনতার পর থেকেই ছিল। কোনও সরকারই একাজ করেনি দু-তিনটে রাজ্য বাদ দিয়ে। ফলে গরীব গরীবই রয়ে গেছে, তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়েনি। কিন্তু এখন সরকারের নীতিতে কৃষক গরীব কৃষকে পরিণত হল, গরীব কৃষক ক্ষেত মজুরে পরিণত হল, ক্ষেত মজুর পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে গেল।

গত আট বছরে এটা তীব্রতর হয়েছে। আমরা তাই দেখলাম যদি কৃষককে না বাঁচাতে পারি, তাহলে এ দেশ বাঁচবে না। এখনো প্রতিদিন পঞ্চাশ জন কৃষক আত্মহত্যা করছে। এর কারণ ফসলের দাম না পাওয়া। বেশি সুদে কৃষি-ঋণ নিতে হচ্ছে। দেশে এখন গাড়ির ঋণে সুদের থেকে কৃষি-ঋণে সুদের হার বেশি। ব্যাংকের থেকে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না— বেসরকারি ঋণ করতে হচ্ছে চড়া সুদে। এর ফলে কিছুতেই ফসল বিক্রি করে চাষের খরচ উঠছে না। এটাই মূল সংকট। সরকার যা দাম নির্ধারণ করেছে, তার থেকে উৎপাদনের খরচ বেশি। এ বছর সরকার ধানের দাম ঠিক করলো কুইন্টাল প্রতি ২০৪০ টাকা, কিন্তু খরচ হচ্ছে ২৫০০ টাকা। প্রথমেই কুইন্টাল পিছু অনেকটা কম পেল, তাও পেল মাত্র ১০ শতাংশ কৃষক। এটা মাণ্ডির হিসেব। আর যেখানে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

নবনির্বাচিত পদাধিকারি সহ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ

মানস দাস

● **সভাপতি**—মানস দাস ● **সহ-সভাপতি**—প্রশান্ত সাহা, রবীন্দ্রনাথ সিংহরায়, নিবেদিতা দাশগুপ্ত ● **সাধারণ সম্পাদক**—বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ● **যুগ্ম-সম্পাদক**—দেবব্রত রায় ● **সহ-সম্পাদক**—প্রণব কর, শাশ্বতী মজুমদার ● **কোষাধ্যক্ষ**—লিটন পাণ্ডে ● **দপ্তর সম্পাদক**—প্রশান্ত চন্দ ● **সংগ্রামী হাতিয়ার সম্পাদক** —মানস কুমার বড়ুয়া ● **সংগ্রামী হাতিয়ার সহযোগী সম্পাদক** —সুমন কান্তি নাগ।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ বিজয় শঙ্কর সিংহ, আশীষ ভট্টাচার্য, সুমিত ভট্টাচার্য, গীতা দে, অভিজিৎ বোস, জয়দেব হাজরা, সোমনাথ পোদ্দার, সুতপা হাজরা, দেবলা মুখার্জী, অতনু মিত্র, উৎসর্গ মিত্র, রুবি সিন্হা, বিদ্যুৎ দাস, সৌমেন দত্ত, বাবলু ঘোষ, সুদীপ সামন্ত।

সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদকের ছবি এই সংখ্যার প্রথম পাতায় রয়েছে।

প্রশান্ত সাহা

রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

নিবেদিতা দাশগুপ্ত

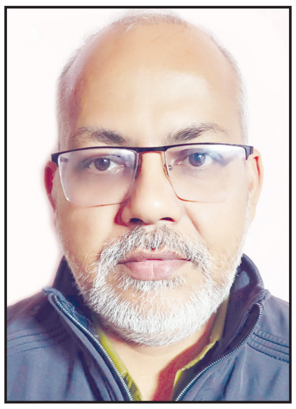

প্রণব কর

শাশ্বতী মজুমদার

লিটন পাণ্ডে

প্রশান্ত চন্দ

মানস কুমার বড়ুয়া

সুমন কান্তি নাগ

আশীষ ভট্টাচার্য্য

সুমিত ভট্টাচার্য্য

গীতা দে

অভিজিৎ বোস

জয়দেব হাজরা

সোমনাথ পোদ্দার

সুতপা হাজরা

দেবলা মুখার্জী

অতনু মিত্র

উৎসর্গ মিত্র

রুবি সিন্হা

বিদ্যুৎ দাস

সৌমেন দত্ত

বাবলু ঘোষ

সুদীপ সামন্ত

সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর কিছু মুহূর্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান

সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও জেলা সাংস্কৃতিক টিম, এছাড়াও জেলার ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক দল সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।

তৃতীয় দিনে প্রতিনিধিদের আলোচনার পরবর্তীতে কোষাধ্যক্ষ লিটন পাণ্ডে আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর এবং দেবব্রত রায় প্রস্তাবাবলীর উপর জবাবী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুমন কান্তি নাগ, দপ্তর সম্পাদক অভিজিৎ বোস সম্মেলনের হাজিরা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বিগত ১৫ মে থেকে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠিত কর্মসূচীর সাফল্যকে তুলে ধরেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক মনোজিৎ দাস।

তিন দিন ধরে সংগঠিত এই সম্মেলনের সমগ্র প্রসঙ্গকে ধারণ করে জবাবী বক্তব্য উপস্থাপনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা। দেশ ও রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী ও জনবিরোধী নীতি সমূহের বিরুদ্ধে তথা রাজ্যের কর্মচারীর অর্থনৈতিক ও অধিকারগত দাবির স্বপক্ষে বিগত দিনে সংগঠনের গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচী ও তার সাফল্য নির্মাণের কারিগর হিসাবে রাজ্যের সংগ্রামী সমাজকে আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল করার আহ্বান করেন।

সম্মেলনের সমগ্র ডক্যুমেন্টস সমর্থিত ও গৃহীত হওয়ার পরে, সেই গৃহীত কর্মসূচীকে রূপায়িত করার স্বার্থে সম্মেলন মঞ্চ থেকে মানস দাসকে সভাপতি ও বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক রেখে ১০৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি হয়। এই কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী কার্যকালের জন্য সংগঠন পরিচালনার স্বার্থে যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে দেবব্রত রায়, সহ সম্পাদক হিসাবে প্রণব কর ও শাশ্বতী মজুমদার, দপ্তর সম্পাদক হিসাবে প্রশান্ত চন্দ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে লিটন পাণ্ডে সহ ২৮ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীকে নির্বাচিত করে। আগামী কার্যকালের জন্য নির্বাচিত নতুন নেতৃত্বের পরিচিতির পরবর্তীতে বিদায়ী সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্যের সমাপ্তি ভাষণ ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে এই মহতী সম্মেলনের। □

সুমন কান্তি নাগ

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

উদ্বোধকের বক্তব্য

মাণ্ডি নেই, সেখানে ধানের দাম ১২০০-১৫০০ টাকা কুইন্টাল। গোটা দেশে এই চিত্র। কতদিন এই ভাবে বেঁচে থাকা যায় ? এ কারণেই তাদের সন্তানেরা কৃষক হতে চায় না। আগে সরকার সার উৎপাদন করতো। এখন কারখানা তুলে দিয়ে বিদেশ থেকে সার আনা হচ্ছে। ফলে সারের দাম বেড়েছে বহু গুণ। বীজের দাম বেড়েছে ১০০০ গুণ পর্যন্ত। এখন প্রতি বছর বীজ কিনতে হয়, বীজ থেকে বীজ হয়না। শহরের লোক এগুলো জানে না। বাস্তব হচ্ছে, আত্মহত্যা কেউ শখ করে করে না, বাধ্য হয়ে করে। কৃষক সভা একমাত্র সংগঠন, যারা দিল্লীতে আত্মঘাতী কৃষকদের পরিবারকে নিয়ে সমাবেশ করেছে। এর আগে কেউ আত্মহত্যার খবর জানতোই না। প্রথম এ খবর লেখেন পি সাইনাথ। কৃষক সভা সমাবেশ করে প্রমাণ করে কৃষকের আত্মহত্যার কথা। আজ পর্যন্ত চার লাখের ওপর কৃষক আত্মহত্যা করেছে। প্রতি দিন করছে।

এই অবস্থায় আমরা আন্দোলন শুরু করি। এর পরেই নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের ওপর একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনেন। প্রধান মন্ত্রী হওয়ার আগে উনি নিজে তিনশোর ওপর জনসভায় বলেছিলেন যে উনি প্রধান মন্ত্রী হলে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ন্যায্য দাম কিন্তু আমরা ঠিক করিনি। ভারতবর্ষের সেরা কৃষি বিজ্ঞানী স্বামীনাথন, তাঁর নেতৃত্বে যে কমিশন হয়েছিল, সেই কমিশন তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে যে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম হওয়া উচিত উৎপাদনের খরচের অন্ততঃ দেড় গুণ। এতে মোটামুটি তার চলে যাবে, তাকে আত্মহত্যা করতে হবে না। এটাই মোদি কার্যকরী করবেন বলেছিলেন। এর ওপরেই কৃষকেরা তাঁকে বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হওয়ার তিন মাসের মধ্যে এই মোদিই সুপ্রিম কোর্টে হলফ-নামা দিয়ে জানালেন যে এই দাম দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না। এতো বড় মিথ্যাবাদিতা, এতো বড়ো জালিয়াতি কোনও দিন কোনও প্রধান মন্ত্রী কৃষকদের সাথে করেননি। এর পরেই আমরা কৃষক সংগঠনগুলো ঠিক করলাম যে এটা মেনে নেওয়া যায় না এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হবে।

মোদি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন এগারো জন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি হয়েছিল যার চেয়ারম্যান ছিলেন মোদি স্বয়ং। সেই কমিটিও জানিয়েছিল স্বামিনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে নেওয়া উচিত। অথচ নিজে প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেটা দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন কোনও ঋণ মকুব হবে না। অথচ স্বামীনাথন কমিশন বলেছিল যে অন্তত এক বার কৃষকদের ঋণ মুক্ত করে দেওয়ার কথা, যাতে সে ঋণ মুক্ত হয়ে চাষ করতে পারে এবং আর তাকে ঋণ করতে না হয়। এতে তার ক্রয় ক্ষমতাও বাড়বে এবং ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে বাজার বিকশিত হবে, মাল বিক্রি হবে, শিল্পের উন্নতি হবে। এটা সরকার করলো না। মোদির আগের কথাগুলো জুমলা ছিল।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই তিনি ভূমি অধিগ্রহণের অর্ডিন্যান্স আনলেন। এর আগে আমরা কৃষকেরা লড়াই করে ব্রিটিশ আমলের আইনের বদল ঘটাতে পেরেছিলাম। সেই ব্রিটিশ আইনে ছিল যে কালেক্টরেরা গিয়ে চাষির যে কোনও জমি অধিগ্রহণ করেত পারবে। মনমোহন সিং-এর সময়ে সে আইনের পরিবর্তন হয়। সত্তর জন বামপন্থী এম পিরও একটা ভূমিকা ছিল এই পরিবর্তনের পিছনে। কিছু সুবিধা এতে হয়েছিল। কৃষকের মতামতের একটা মূল্য সেবারে এসেছিল। দ্বিতীয়ত বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য চার গুণ দেওয়ার কথা থাকলো। তৃতীয়ত পাঁচ বছর অবধি সেই জমি ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে তা জমির মালিককে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। আদালতে যাওয়ার অধিকার পাওয়া গিয়েছিল। আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু মোদি এসে অর্ডিন্যান্স করে সব কয়টা সুবিধা কেড়ে নিলেন। আসলে কর্পোরেটের টাকায় উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। চোদ্দ হাজার কোটি টাকা খরচা করে আদানি-আম্বানিরা ওনাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিল। ওদের পা চাটা ছাড়া, ওদের দালালি করা ছাড়া ওনার কোনও রাস্তা নেই। আদানিকে অস্ট্রেলিয়ায় সাথে করে নিয়ে গিয়ে বলছেন তাকে কাজ দেওয়ার কথা। আগে ঘুরিয়ে দালালি করা হতো, এখন সরাসরি দালালি করা হচ্ছে। ওদের কথা দিয়েছিলেন কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে ওদের পাইয়ে দেওয়ার কথা, অর্ডিন্যান্স করে সেটাই করলেন।

অর্ডিন্যান্সের দিন থেকেই আমরা বুঝেছিলাম আমাদের সর্বনাশের শুরু হল। গোটা ভারত বর্ষের সামনে আমরা ডাক দিয়েছিলাম এই আইন জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্যে। অন্ততঃ পনের হাজার জায়গায় এই আইনের কপি জ্বালানো হয়েছে। আসলে রাগকে প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের দাবি এই কালা কানুন বাতিল করতে হবে। একটা কমিটি তৈরি হয়ে গেল --- ভূমি অধিকার আন্দোলন—পঞ্চাশটা সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। স্বাধীনতার পর থেকে এতো সংগঠন নিয়ে কোনও মঞ্চ তৈরি হয়নি, যা হল ২০১৪ সালে। অর্ডিন্যান্স বাতিল হল। মোদির জীবনের প্রথম পরাজয় এটা। কিন্তু সে শয়তানি করলো অন্য জায়গায় , বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে বলল আলাদা আইন তৈরি করে কৃষকের জমি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে। সেটা শুরু হল। আমরা তখন বললাম আইন রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধেও লড়াই শুরু করতে হবে।

সে আন্দোলন শুরু হল ২০১৭ সালে। শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মধ্য প্রদেশের সরকার গুলি চালিয়ে ছয় জন কৃষককে হত্যা করে। আবার আমরা এককাট্টা হলাম এবং এবারে প্রায় দেড়শ সংগঠন এককাট্টা হল। এক নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হল—অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতি। আমাদের দুটো দাবি—ফসলের দেড় গুন দাম দিতে হবে এবং একবার কৃষি ঋণ মকুব করতে হবে। ১৯১৮ সাল থেকে শুরু হল বৃহৎ আন্দোলন। এলো কোভিড। মোদি বললেন তোমরা সব ঘরে ঢুকে যাও। অনেকেই ঘরে ঢুকে গেল, কিন্তু কৃষকেরা বলল আমরা এমনিতেই মরে আছি, আমরা ঢুকবো না আমরা রাস্তাতেই থাকবো। তাই ছিলাম আমরা। প্রথমে আমরা একলাই ছিলাম, তারপর পরিবারের লোকজন যোগ দিল, তারপর পাড়াপড়শিরাও চলে এলো। কোভিড আমাদের থামাতে পারেনি। আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিলো।

মোদি ভেবেছিলেন কোভিডের সুযোগে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেবেন। সেটা না হওয়ায় নামিয়ে আনলেন তৃতীয় আক্রমণ— তিনটে কালা কানুন। এগুলো পাশ হওয়া মানে কৃষক শেষ হয়ে যাওয়া। আমাদের দেশে কৃষি কৃষক ভিত্তিক। মোদি চান কৃষি হোক কর্পোরেট ভিত্তিক। আদানি-আম্বানি হবে মালিক আর কৃষক হবে তার জমিতে ক্রীতদাস। ওই তিনটে আইনেরই লক্ষ্য ছিল রেশন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেওয়া, প্রোকিওরমেন্ট না করা, মাণ্ডি উঠিয়ে দেওয়া। যা হবে, সব খোলা বাজারে। ব্যাপারীরা যা দাম ঠিক করবে, সেটাই কৃষককে নিতে হবে। আমরা তিনটেকেই বাতিলের দাবি করলাম। এবারে আমাদের সাথে যোগ দেওয়া সংগঠনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় আড়াইশো।

আমরা যখন কেন্দ্রীয় ভাবে আন্দোলন করছিলাম, তখন বিভিন্ন রাজ্যেও একই দাবি নিয়ে আরও কিছু সংগঠন লড়াই চালাচ্ছিল। আমরা তাদের বললাম দাবি যখন এক, শত্রুও যখন এক, তখন আর আলাদা লড়াই করবো কেন? মিটিং ডাকলাম। এবারে আমাদের সংখ্যা হল পাঁচশো ! সংগঠনগুলো নিজের সত্তা বজায় রাখবে, কিন্তু ইস্যু ভিত্তিক লড়াইয়ে আমরা এককাট্টা হলাম। তৈরি হল সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা।

আমরা বললাম দিল্লীতে গিয়ে আমরা সরকারকে মেমোরাণ্ডাম দেবো। মোদি বলল দিল্লীতে ঢুকতে দেবো না। যেন দিল্লী ওনার পৈত্রিক সম্পত্তি। আমরা বললাম আমরা যাবোই। পদযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। আমরা মারামারি করতে যাচ্ছি না, যেখানে আটকে দেবে, আমরা বসে যাবো সেখানে। ওরা লাঠি, জল কামান চালিয়েও রুখতে পারলো না। তখন ন্যাশনাল হাইওয়ে তিন ফুট করে কেটে দিল ! ভাবা যায় ? তাও কৃষকেরা মাটি দিয়ে ভর্তি করে এগিয়ে গেল। তখন দিল্লী সীমান্তে বোল্ডার ফেলে, কংক্রিটের দেওয়াল দিয়ে আটকে দেওয়া হল ন্যাশনাল হাইওয়ে। আমরা বললাম এখানেই বসে যাবো। লক্ষ লক্ষ কৃষক বসে গেল। আমাদের বলা হল আমরা নাকি মাওবাদী, খালিস্তানি, দেশদ্রোহী। অন্নদাতাদের দেশদ্রোহী বানিয়ে দেওয়া হল। শীত-গ্রীষ্ম কিছু মানিনি। আমরা অনড় ছিলাম। এই জেদ ভারতে নতুন। পাঁচশো সংগঠন এককাট্টা।

সরকার লোক দেখানি একটা করে মিটিং ডাকে আর চিটিংবাজি করে। বলে আইনের সংশোধনী দাও। কিসের সংশোধনী? মূলটাই তো বিষাক্ত। আমরা বললাম কোনও সংশোধনী না, আমরা প্রত্যাহার চাইছি। শেষ পর্যন্ত লড়াই করা হল। তিনটে ভারত বন্ধ হল। এমন অবস্থা হল, ভারতে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ডাক দিলে সবাই তাতে সাড়া দিতে শুরু করলো। এটা একটা নতুন ঘটনা। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর স্লোগান আমরা বরাবর দিয়েছি, কিন্তু এতদিন সেটা হয়নি—এবারে সেটা হল। আমরা, কৃষকেরা যে ডাক দিচ্ছি আন্দোলনের, শ্রমিকেরা পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। ডাক দিলাম ভারত বন্‌ধের—সফল হল। এই সফল তো কৃষকেরা করেনি, করেছে দেশের ত্রিশ-চল্লিশ কোটি শ্রমিক। তিনবার ভারত বন্‌ধ হল, সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম শ্রমিকেরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে এবং তাকে সফল করার চেষ্টা করছে। এটা নতুন ঘটনা। আমরা জানি, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর মধ্যে দিয়েই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এক ধাপ এগুবে। এটা বক্তৃতার মধ্যে এতদিন ছিল, কিন্তু বাস্তবে ছিল না। আজকে কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তা বাস্তবের চেহারা নিল। এই মৈত্রী আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে। এটাই হবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের লড়াইয়ের বনিয়াদ। আমরা এক ধাপ এগিয়ে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি বুঝলেন যে এদের হারানো যাবে না, তাই হঠাৎ করেই এক দিন ঘোষণা করলেন যে এই তিনটে বিল আমি তুলে নিচ্ছি। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতি গুটিয়ে গেল। মোদি মাথা উঁচু করে দুনিয়াকে গোলাম বানাচ্ছিলেন, এখন তাকেই গোলাম বানিয়ে উঁচু মাথাকে মাটিতে নামিয়ে এনে নাক ঘষে দিলেন কৃষকেরা। ঘষে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে মোদি অনেককে চিনলেও কৃষকদের এখনো চেনেননি। কৃষকেরাই তাকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। আমরা বললাম আমাদের দাবি আরও আছে। সরকার লিখিত ভাবে বলল তারা ভেবে দেখবে। ইলেক্ট্রিসিটি বিলের ব্যাপার আছে, ফসলের দামের ব্যাপার আছে, প্রায় ৭৫০ জন কমরেড আমাদের মারা গেছেন, তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ব্যাপার আছে, প্রায় ৪৫ হাজার মিথ্যে মামলা সরকার করেছিল আমাদের বিরুদ্ধে সেগুলো তুলে নেওয়ার ব্যাপার আছে। সরকার বলেছিল লিখিত ভাবে যে তারা এগুলোর সমাধান করবে। আজ এক বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া নেই। কি করবো আমরা? ঘরে বসে থাকবো?

আমাদের আন্দোলনে আপনাদের কাছ থেকে, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি মধ্যবিত্ত সংগঠনগুলোর কাছ থেকেও আমরা অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। আপনারা সাহস দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের। লঙ্গরখানাগুলো আমাদের খাবার যুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আপনাদের সাহায্য না পেলে এক বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। মানুষ ভেবেছিল মোদিকে হারানো যাবে না। কৃষকেরা সেই মিথকে ভেঙ্গে দিতে পেরেছেন। যদি আমরা এক থাকি, বিভেদ ভুলে শত্রুকে চিহ্নিত করে লড়াই করতে পারি, তাহলে শত্রু যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, তাকে হারানো অবশ্যই যাবে। এই আত্মবিশ্বাসটা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছি। এটা কৃষক আন্দোলনের সাফল্য। গোটা পৃথিবীর ১১০ টা দেশ আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। বিভিন্ন দেশে কৃষকেরা আমাদের দেশের দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

বিশ্বের সেরা বুদ্ধিজীবীদের একজন নোয়াম চমস্কি বলেছেন ভারতের কৃষক আন্দোলন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে একটা 'বীকন লাইট'।

কিন্তু এখনো আমাদের বাকি আছে। দাবি আমাদের পূরণ হয়নি। আজ আমাদের মিটিং আছে। আমরা সিদ্ধান্ত যৌথ ভাবেই নিই, এবারেও নেবো। গত ২৬ নভেম্বর সিদ্ধান্ত হয়েছিল রাস্তায় নামার। সেই অনুযায়ী ২৫টা রাজ্যের রাজধানীতে কৃষক সমাবেশ করে গভর্নরের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে এই বলে যে, এই বিশ্বাসঘাতক সরকারকে আপনি সামলান, না হলে আমরা বড়ো আন্দোলনে যাবো। এবারেও ২৬ জানুয়ারি বড়ো কোনও প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত হবে আজ, কারণ গত বছর এই দিনেই মোদি তার ডান হাতকে লেলিয়ে দিয়ে, লাল কেল্লায় পতাকা তুলিয়ে আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করেছিল। পার্লামেন্ট অভিযান হবে ফেব্রুয়ারিতে বাজেট সেশনের সময়ে। ঐ সময়ে হাজারে হাজারে আমরা আবার যাবো। কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। এখন ধর্মের নামে, জাতের নামে আমাদের কেউ আলাদা করতে পারে না, আমাদের 'কৃষক' পরিচিতির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এই সব আগামী লড়াইতেও আপনাদের সহানুভূতি, সমর্থন আমাদের চাই।

এখন সংবিধানকে ভেঙ্গে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই খতম করে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে, রাজ্যগুলোকে ফুঁটো জগন্নাথ করে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সামগ্রিক ভাবে লড়াই করতে হবে একত্রিত হয়ে। আলাদা আলাদা লড়াই করে এর বিরুদ্ধে জেতা যাবে না। এ শত্রু এতটাই শক্তিশালী যে, কোনও সংগঠনই তার একার জোরে এর সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। আমাদের এক হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তাহলেই জেতা যাবে। কৃষক আন্দোলন এটা প্রমাণ করেছে। বিভেদ থাকলেও ইস্যু ভিত্তিক ঐক্য তৈরি করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এতেই নরেন্দ্র মোদির আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে, এটাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা।

পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সামগ্রিক ঐক্য হয় না। ঐক্য ছাড়া আমাদের সামনে কোনও রাস্তা নেই। পশ্চিমবঙ্গের জন্যেও এটা সত্যি। দুটো সরকারই এক। আপনাদের অভিজ্ঞতাতেও এটা দেখছেন। শিক্ষা নিয়ে কি হচ্ছে, আপনারা দেখছেন। কতোগুলো চোর, মিথ্যেবাদী চাকরি পেয়েছে, আর যারা পাশ করেছে, তাদের আন্দোলনের ওপর সরকার লাঠি চার্জ করছে। আপনাদের কাছে আমার নিবেদন যে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করুন, কেউ ভাঙনের চেষ্টা করলে তাকে প্রতিরোধ করুন। ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যাংকের তাঁবেদার সরকার, সব কিছু বেচে দেওয়া সরকার, মানুষের কাজ কেড়ে নেওয়া সরকারকে নতজানু হতে বাধ্য করতে হবে।

আমরা তিনটে কালা কানুন বাতিল করাতে পেরেছি। কিন্তু আপনাদের ওপরেও আক্রমণ আছে। যে চারটে লেবার কোড আপনাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ইউনিয়ন করার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও লড়াইকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সেটা সম্ভব হবে আগামী দিনে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী ঐক্যের মধ্যে দিয়েই।

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার আন্দোলনের পাশাপাশি চলবে শ্রেণীর আন্দোলন। শ্রেণিগত আন্দোলন আর অ-শ্রেণীগত আন্দোলন , দুটো পাশাপাশি হবে। শ্রেণি বহির্ভূত আন্দোলন হল এস কে এম। এখানে সব পন্থীরাই আছে। আমরা ঠিক করেছি ৫ই এপ্রিল অন্ততঃ ৫ লক্ষ মানুষের জমায়েত দিল্লীতে করবো, যা ভারতবর্ষে এর আগে হয়নি কখনও। সেখানে ক্ষেত মজুর, কৃষক, শ্রমিক থাকবে। সেটা শ্রেণি আন্দোলন। দুই আন্দোলনেই ঐক্য চাই। আশা করবো আপনারাও এই আন্দোলনে সামিল হবেন আরও বড়ো করে এবং আমরা দেখিয়ে দেবো যে, মোদিকে যেমন এর আগে ঝুঁটি ধরে নাক ঘষে দেওয়া গেছে, তেমনই ২০২৪-এ ঝুঁটি ধরে ক্ষমতা থেকেও বিদায় করে দিতে পেরেছি। মোদি যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে আমাদের কোনও সমস্যার সমাধান হবে না—এটা না বুঝতে পারলে আমরা নিজেরাই আত্মহত্যার পথ বেছে নেবো। মোদি যদি ২০২৪-এ আবার ফিরে আসে, দেশে মানুষ বলে আর কিছু থাকবে না। আমি আশা করি আপনারা এই সম্মেলনের থেকে ঐক্যকে শক্তিশালী করবেন এবং সমস্ত অংশের মানুষ আমরা এক হয়ে এই স্বৈরতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্টিক অত্যাচারের অবসান ঘটাবো। সেই পরিকল্পনা আপনারা গ্রহণ করবেন, এই আশা আপনাদের ওপর রেখে, আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে, লাল সেলাম জানিয়ে এই সম্মেলনকে উদ্বোধন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। □

অনুলিখন : উৎসর্গ মিত্র

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

বর্ণময় এবং স্লোগান মুখর উদ্বোধনী মিছিল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আজীবন বামপন্থী প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের নামকরণ করা হয়েছিল তরুণ মজুমদার নগর। সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড মলয় রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মেলন স্থল রবীন্দ্র ভবনের নামকরণ করা হয়েছিল মলয় রায় মঞ্চ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অতীত ঐতিহ্যকে ধারন করেই রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ সম্মেলনের আগের দিন অনুষ্ঠিত বড়ি পোস্টার-প্ল্যাকার্ড, রক্তপতাকায় সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী মিছিল গোটা জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে। উদ্বোধনী মিছিলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা ছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার কর্মচারীরাও বিপুলসংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের মাথায় ছিল বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের লোগো সম্বলিত লাল টুপি যা মিছিলের দুধারে দাঁড়ানো পথচলতি মানুষজন এবং জলপাইগুড়ি জেলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষজনদেরকে আকৃষ্ট করেছে। সাধারণ মানুষ এবং কর্মচারীদের দাবি সম্বলিত বড়ি-পোস্টার, লালপতাকা হাতে স্লোগান মুখরিত মিছিল দেখতে গোটা জলপাইগুড়ি শহরের সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের শুরুতে ছিল লালপতাকা লাগানো ১০ জন বাইক আরোহী। পরবর্তীতে মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ, তারপরবর্তীতে ২০টি রক্তপতাকা হাতে বিশেষ সাজে সজ্জিত ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক, পরবর্তীতে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি সহ জলপাইগুড়ি জেলার বিপুল অংশের কর্মচারী সমাজ। শহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে দেড়ঘণ্টা পথ পরিক্রমা করা এই মিছিলকে এ. আই. এল. ইউ, বীমা কর্মচারী সমিতি, সি. আই. টি. ইউ, এ. আই. কে এস, সারা ভারত ক্ষেতমজুর সংগঠন, এস এফ আই, ডি. ওয়াই. এফ. আই, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন, এবিটিএ, এবিপিটিএ, বিইএফআই, ১২ই জুলাই কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি, সেন্ট্রাল গভঃ পেনশনার্স সমিতি, গণনাট্য সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয় যা মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে আগামীর কঠিন লড়াইতে বাড়তি প্রত্যয় জুগিয়েছে। শ্লোগানে মুখরিত মিছিলের দীপ্ত পদচারণা গোটা জলপাইগুড়ি শহরে এতটাই উত্তাপ যুক্ত করেছিল যে সুসজ্জিত মিছিলের গতিপথ নির্দিষ্ট অভিমুখে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন বাধ্য হয় সহযোগিতা করতে। জলপাইগুড়ি শহরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে প্রশাসনের এই ভূমিকা কিছুটা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। মিছিলে অন্যান্যদের সঙ্গে পা মেলান বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের মাননীয় উদ্বোধক, দেশজোড়া কৃষক আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতৃত্ব হান্নান মোল্লা, বিশেষ অতিথি, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি সুভাষ লাম্বা এবং রাজ্যের চা শ্রমিক আন্দোলন তথা গণআন্দোলনের নেতৃত্ব জিয়াউল আলম। □

দেবাশীষ রায়

রাজ্য সম্মেলন থেকে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

- স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক সংস্থাসমূহের স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে।
- ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহের ৭৫ বছর।
- ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের ৭৫ বছর।
- পরিবেশ রক্ষা ও জলপায়ু সংরক্ষণের দাবিতে।
- কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং সংবিধান ৩৭০ ধারা পুনঃ অন্তর্ভুক্তিকরণ ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে।
- দেশের সংবিধান ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা, বিভিন্ন স্বশাসিত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হিন্দুত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টার বিরুদ্ধে।
- শ্রম আইন সংস্কারের নামে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসহ, ব্যাঙ্ক-বীমা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে।
- কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান এবং কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী নয়া কৃষি আইন বাতিলের পরবর্তীতে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদান ও বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বাতিলের দাবিতে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে।
- নারীদের উপর আক্রমণ সহ সমস্ত ধরনের লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবিতে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করা এবং এই রাজ্য সহ সমগ্র দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ ও পশ্চাদপদ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রতিবাদে।
- শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দাবিতে।
- উগ্র হিন্দুত্ববাদ সহ সমস্ত ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষার দাবিতে।
- কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নাগরিক অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে।
- কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত মিডিয়ার জনবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে।
- শ্রমজীবীদের ঐক্য বিরোধী বিভেদপন্থী পরিচিতি সত্বার রাজনীতির বিরুদ্ধে।
- সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন বিদেশনীতির পক্ষে।
- কোভিড অতিমারী সহ রোগ প্রতিরোধক্ষম পরিকাঠামো সহ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রসারের দাবিতে।
- রাজ্য ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে।
- রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে এবং স্বৈরাচারী আক্রমণের বিরুদ্ধে।
- প্রশাসনে আধুনিকীকরণের নামে চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগের বিরুদ্ধে ও শূন্যপদে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে।
- ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করে কর্মচারী স্বার্থে চালু করা এবং কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ও অর্জিত অধিকারের ন্যায়সঙ্গত স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে।
- নীতিহীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হয়রানিমূলক বদলির বিরুদ্ধে।
- অনিয়মিত / চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ এবং নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতনের দাবিতে।
- দেউচা পাঁচামি খোলামুখ কয়লাখনি প্রকল্প বন্ধের দাবিতে।
- সর্বভারতীয় দাবিদাওয়া প্রসঙ্গে।
- রাজ্য স্তরের দাবিদাওয়া প্রসঙ্গে।
- এছাড়াও 'চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সংগঠিত করা সংক্রান্ত প্রস্তাব' পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং সম্মেলন তা সরাসরি গ্রহণ করে। □

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২০তম রাজ্য সম্মেলনের অন্তর্বস্তু ও বহিরঙ্গের সাথে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গণসংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ওই তিনদিনের সন্ধ্যায়।

বর্তমানে রাজ্যের এক অন্ধকারময় পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্যের শাসকদল প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে রাজ্যের সুস্থ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যেমন তথাকথিত কোনো শহীদ মঞ্চে চলে তারস্বরে হিন্দি নাচ-গান, আবার যে কোনো উৎসবে—উৎসবের প্রাধান্য না থেকে, শুধু নির্লজ্জভাবে শাসকদলের রাজনৈতিক প্রচার থাকে। যেমন সম্প্রতি চলচ্চিত্র উৎসবে দেখতে পাই চলচ্চিত্রর গুরুত্বর থেকে অর্থাৎ উৎসবের স্থানজুড়ে কোনো পরিচালক, কলাকুশলীর পোস্টার না দিয়ে রাজ্যের কর্ণধার সহ নেতা-মন্ত্রীদের পোস্টারে ভড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার পৌষমেলার যে গুরুত্ব, রবিঠাকুরের যে গুরত্ব তা দিনে দিনে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে পৌষ মেলার চারিদিকে রবিঠাকুরের ছবির পরিবর্তে রাজ্যের কর্ণধার, নেতা-মন্ত্রীদের ছবি। ঠিক এইরকমই একটা পরিস্থিতিতে ভিন্ন মাত্রার সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর জন্য আমরা জলপাইগুড়ি জেলার অভ্যর্থনা কমিটি ও সাংস্কৃতিক উপসমিতিকে জানাই 'রক্তিম অভিনন্দন'। 'লাল সেলাম' জানাই এইরকম সুন্দর সুস্থ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য, যার মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩ ডিসেম্বর '২২ শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে সুন্দর ও সুবিশাল মিছিল ও তারপর প্রগতিশীল পুস্তক বিপনী কেন্দ্র উদ্বোধনের পরে পাশেই তৈরি সাংস্কৃতিক মঞ্চে শুরু হয় সুন্দর অনুষ্ঠান। সাধারণত উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়, কিন্তু জেলা সাংস্কৃতিক শাখা মনোরম পাঁচটি নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। নৃত্য পরিবেশনায় 'অহনা বোস' নামক ১৪ বছরের সুন্দর একজন মেয়ে। যাঁর বাবা ছিলেন ডি.এম অফিসের একজন করণিক, বর্তমানে পেনশনার্স ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অপূর্ব বোস। অহনার প্রতিটি নৃত্যই সবাইকে মুগ্ধ করে। পরবর্তীতে শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। শুরুতেই সকলের খুব পরিচিত ও প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সপ্তক সানাই দাস-কে পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে নেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক মনোজিত দাসে। সপ্তক সানাই দাস রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে শুরু করেন ও স্বরচিত গান সহ মোট পাঁচটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রতিটি সঙ্গীতই খুবই সময়োপযোগী ছিল।

২৪ ডিসেম্বর '২২ আরেকটি অন্যরকম সন্ধ্যা আমাদের উপহার দিল জলপাইগুড়ি জেলার 'কলাকুশলী নাট্য সংস্থা'। রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নাট্যব্যক্তিত্ব তমোজিৎ রায়ের লেখা ও নির্দেশনায় একটি চল্লিশ মিনিটের ছোট্ট নাটক—'অন্ধকারের দেশে'। যার আলোক পরিকলনায় ছিলেন সৌরভ ঘোষ। নাটকটি খুব বাস্তব ঘটনা ও সমস্যাগুলি খুব সুন্দরভাবে অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। করোনার সময় দেশের লকডাউনে শ্রমিক-মজুরদের অবস্থা ও সমস্যা সহ আমাদের রাজ্যে নৈরাজ্যের অবস্থা, মহিলাদের নির্যাতনের চিত্র, শাসকদলের দাদাদের তোলাবাজি ইত্যাদি সবটাই তুলে ধরেছেন লেখক। সর্বোপরি সমগ্র নাটকটি খুবই সুন্দর হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর '২২-এর সম্মেলনের শেষ সন্ধ্যায় সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। জেলার ডি. ওয়াই. এফ. আই, এস. এফ. আই-এর নেতা-কর্মীগণ যেমন প্রাণবন্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তেমনি জেলার সাংস্কৃতিক শাখা প্রতিনিধিদেরও আহ্বান করেন শেষ দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য। অনেক জেলা ও সমিতির পক্ষ থেকেই প্রতিনিধিরা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

তিনদিনের সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য জলপাইগুড়ি জেলার অভ্যর্থনা কমিটি ও তার সাংস্কৃতিক শাখাকে অনেক অভিনন্দন। □

কুমকুম মিত্র

সত্যজিৎ রায় প্রগতিশীল পুস্তক বিপণি উদ্বোধন

সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা। আর সেই শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি বই থেকে। সামাজিক বোধ সৃষ্টি, সুস্থ-সাংস্কৃতিক বোধের উন্মেষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার বিকাশ গনচেতনা সৃষ্টিতে বই একান্ত আপনজন। কুয়োর ব্যাঙ না হয়ে চর্চার মধ্যে দিয়ে একজন কর্মী নেতৃত্ব-সংগঠক হিসাবে উপকৃত হতে পারি। বইয়ের দ্বারা সেটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে পারে একমাত্র শিক্ষা-জ্ঞান। এর জন্য চাই মতাদর্শের বই পড়া। আর এই বিভিন্ন ধরনের বই একজায়গায় পেতে প্রয়োজন মতাদর্শগত বুক স্টল।

এই কথাগুলি বলেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব 'সত্যজিৎ রায় স্মরণে প্রগতিশীল গ্রন্থ বিপনি' নামাঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিংশতি রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধক রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। তিনি গর্বিত শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত বুক স্টলের জন্য। কারণ সত্যজিৎ রায় সমাজ সচেতন প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। প্রচ্ছদ শিল্পী হিসাবে দক্ষতা পাশ্চাত্য সংগীত ছবিতে ব্যবহার ভূমিকা-রাজনীতি মনস্কতা সব দক্ষতাই তার মধ্যে ছিল। তিনি

উদ্বোধক প্রবীর মুখার্জী

বলেন আমরা সকলেই লড়াইয়ের মধ্যে আছি, গণসংগঠন করি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সারা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম সংগঠন। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি। আর প্রযুক্তি যুগে কর্মী-নেতৃত্ব-সংগঠক সকলের দরকার আরও জ্ঞান। ট্রেড ইউনিয়ন যারা করি প্রাথমক কাজ হল বই পড়া, সদস্যদের চেতনা বৃদ্ধি করা, আত্মসংগ্রাম দরকার। এর জন্য দরকার বই পড়া। সেইজন্য দরকার প্রগতিশীল বুক স্টল। তিনি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের পারস্পরিক বিভিন্ন ভূমিকা তুলে ধরেন।

প্রগতিশীল গ্রন্থ বিপনিকে কেন্দ্র করে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। তিনি বলেন জ্ঞান কোনো একক ভিত্তি নয়, বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে, জ্ঞানার্জনের মধ্যে আন্দোলন করতে হবে। তাত্ত্বিক অনুশীলন ও প্রয়োগ অনুশীলনের প্রয়োগ সম্মেলন। শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন বা স্থান আত্মস্থ করা যায় না। পাঠেরও প্রয়োজন। বর্তমানে শাসকশ্রেণীকে পরাস্ত করতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের কর্মচারীদের জন্য শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং বুক স্টলও দরকার। সংগঠন আন্দোলন পরিস্থিতিকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার জন্য তীব্র থেকে তীব্রতর করার জন্যই যেমন বই পাঠের দরকার আর সেই নিরিখেই এই প্রগতিশীল বুকস্টল করা হয়েছে। স্বপ্ন-সমাজ পরিবর্তন করার লক্ষ্যই হল বুক স্টল। □

সুকান্ত চৌধুরী

Editor : SUMIT BHATTACHARYA **State Co-ordination Committee** **Regd. No. : 18484/71**
SANGRAMI HATIAR 50th Year, 8th Edition, December 2022

২০তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন

২৪ ডিসেম্বর '২২ সকাল ৯টায় জলপাইগুড়ি জেলার সাংস্কৃতিক শাখার সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিনিধি সহ জেলার বিভিন্ন ব্লক-মহকুমা থেকে বহু কর্মচারীর

তমোজিৎ রায়, সভাপতি, অভ্যর্থনা কমিটি

উপস্থিতিতে রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের গুরুত্ব, মর্যাদা ও সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। উদ্বোধক সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি হান্নান মোল্লা বক্তব্যের পরে ২০টি বাতি জ্বেলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি উদ্বোধক সম্মেলনের স্মারক উদ্বোধন করেন। এবং উদ্বোধককে বাংলাদেশ কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকেও স্মারক উপহার দেওয়া যায়।

সভায় বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং নাট্যব্যক্তিত্ব তমোজিৎ রায় বলেন, প্রথমেই হান্নান মোল্লাকে অভিনন্দন জানাই, যাঁর বা যাঁদের নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক শাসকের চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছিল সর্বনাশা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে, যে লড়াই এখনো চলছে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শাসকের চোখে চোখ রেখে কথা বলা যায়। মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত নেতৃত্ব ও আগত সমস্ত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। বন্ধু, যে সময়ে আমাদের এই বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে, সে সময়টা বড়

নিজামউদ্দিন পাটোয়ারি, বাংলাদেশ

সুখের বা আনন্দের দিন নয়। আমরা জানি বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের যে আর্থিক কাঠামো সেটা একটা চরম অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং সেই কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের পেটোয়া সরকার ক্রমশ দাঁত, নখ বের করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণির উপর নামিয়ে আনছে আঘাত। তাদের ছাঁটাই করা হচ্ছে, কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাজের নানারকম প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শ্রমিকরাও থেমে নেই, তাঁরাও মাঠে নেমে লড়াই করছেন সেই শাসকের বিরুদ্ধে।

আমাদের দেশে একজন স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন 'আচ্ছে দিনের', কিন্তু এই 'আচ্ছে দিন' এসেছে কাদের জন্য—'কর্পোরেট পুঁজির' জন্য। সেই মুষ্টিমেয় এক শতাংশ বা দশ শতাংশ মানুষ যাঁদের সম্পদ ফুলে ফেঁপে উঠছে তার নব্বই শতাংশ মানুষ কৃষক-শ্রমিক দলিত—তাদের জন্য 'আচ্ছে দিন' আসেনি। তাদের দিন ক্রমশ খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। ক্ষুধাসূচকে আমাদের স্থান কোথায় তা আপনারা জানেন। শুধু অপুষ্টিতে বহু শিশু প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে। আপনারা জানেন দেশের সম্পদ বি. এস. এন. এল, কয়লা সব লুঠ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। বিশাল বিশাল লোন নিয়ে কর্পোরেট পুঁজিপতিরা শোধ করছেন না উল্টে তাঁদের হাতেই চলে যাচ্ছে দেশের সব সম্পদ। সর্বনাশা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে। চারটি ভয়ঙ্কর শ্রমকোড দিয়ে শ্রমিকের অধিকার কিভাবে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আপনারা জানেন এবং কর্পোরেট পুঁজিকেও অমাদের কৃষির আঙিনায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চাইছে। তার

মনোজিৎ দাস, সম্পাদক, অভ্যর্থনা কমিটি

বিরুদ্ধেও সমস্ত মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন গর্জে উঠেছে। আর যখনই প্রতিবাদ করা হচ্ছে তখন সেই প্রতিবাদীদের বিভিন্ন তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনো আরবান নকশাল, কখনো নকশাল। কখনো প্রতিবাদীদের দেশদ্রোহীর তকমাও দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর দাঁত-নখ ক্রমশ বেরিয়ে পড়ছে। আর একদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের মননকে-চেতনাকে ক্রমশ বিষিয়ে দিচ্ছে। আমাদের অজান্তে আমরা সেই বিষকে ধারণ করে নিচ্ছি। তীব্র ব্রাহ্মণ্যবাদ-পিতৃতান্ত্রিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে সুর সেই প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত সর্বধর্ম সমন্বয় সেই সুরকে সুকৌশলে বিষিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে পরিচিতিসত্ত্বার রাজনীতি এগিয়ে আসে এবং শ্রেণীরাজনীতি পিছিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই।

সবচেয়ে বড় অন্ধকারময় সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। রাজ্যে প্রশাসন দুর্নীতিকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়েছে। সর্বস্তরে দুর্নীতি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি। আমাদের গায়ে যে কলঙ্কের দাগ লেগেছে তা কি কোনোদিনও মুছবে। আমাদের মাথা সমাজের কাছে নিচু হয়ে গেছে, মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি আমরা কোথা থেকে অর্জন করব? আমাদের বেতন ক্রমশ ক্ষয় হচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি

জিয়াউল আলম, সি আই টি ইউ নেতা

উর্ধ্বগতিতে, যেখানে বেকারী বৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে, ওষুধের দাম উর্ধ্বগামী—এইরকম একটা অবস্থায় আমাদের মহার্ঘভাতা বকেয়া রয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। এই অবস্থা তো

মনোজ সাউ, যুগ্ম আহ্বায়ক, ১২ই জুলাই কমিটি

বেশিদিন চলতে পারে না, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে আর কতদিন চেপে রাখা যাবে। আমাদের অবশ্যই দাবি হবে যে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার সব ফিরে আসুক।

সবশেষে বলব আমাদের জেলার কথা। জলপাইগুড়ি জেলা চা-বাগান, জীব বৈচিত্র্যে ও জনজাতির বৈচিত্র্যে এক মহান জেলা। বহু যুগ থেকে বহু জনজাতির মানুষ আমরা একসাথে বাস করি। কখনো ভাওয়াইয়ার সুর মিশে গেছে, কখনো রবিঠাকুরের গান মিশে গেছে আদিবাসী মাদলের তালে। আমাদের এই ঐক্যের লঙ্ঘিত হয়নি কখনো। কিন্তু আজ আমরা শুনতে পাচ্ছি একটা বেসুরো বিভেদের সুর। যে বিভেদ আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ পুঁতেছে, তেমনি আমাদের জেলাতেও সেই বীজ রোপিত হচ্ছে খুব পরিকল্পিত ভাবে। এর বিরুদ্ধে, সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে

স্বপন বল, ত্রিপুরা

আমাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয়ের পরিষদের মহাসচিব নিজামউদ্দিন পাটোয়ারী, ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল, সি আই টি ইউ-র নেতৃত্ব জিয়াউল আলম, ভেটেরিনারী এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ডা. দেবাশীষ সাহা, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের সভাপতি মুন্সী মোসারফ হোসেন, কে এম ডি এ-র সংগঠনের পক্ষে গৌতম মজুমদার, কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতিসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অরূপ চ্যাটার্জী, স্টিয়ারিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক সংকেত চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষে দেবাশীষ কুণ্ডু, পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির পক্ষে অরিন্দম চক্রবর্তী প্রমুখ। দ্বিতীয় দিনে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ। □

কুমকুম মিত্র

বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি ০৪/২৩ তারিখ ঃ ০৩-০১-২০২৩

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ,
নবান্ন, হাওড়া

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে, এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া প্রদান সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতা ও উপেক্ষার মনোবাব, উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। আমরা এই বিষয়ে বহুবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। সর্বশেষ গত ১০ আগস্ট ২০২২ তারিখে বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ প্রদানের জন্য আপনাকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল (পত্র নং ঃ কো-অর্ডি-৬০/২২ তারিখ ঃ ১০-০৮-২০২২)। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল আপনার দিক থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, কর্মচারী স্বার্থের জরুরি দাবিগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহার্ঘ ভাতা / মহার্ঘ রিলিফের দাবি, যার বকেয়া পরিমাণ বর্তমানে ৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানুয়ারি '২০২৩ মাস থেকে পুনরায় মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করলে সেই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। পেট্রোপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির সময়ে বিপুল পরিমাণ মহার্ঘ ভাতা / রিলিফ বকেয়া থাকার অর্থ কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং এক ধরনের আর্থিক বিপন্নতা সৃষ্টি করে।

স্বভাবতই নিরুৎসাহ ও বিপন্নতার যৌথ নেতিবাচক প্রভাব থেকে রাজ্য কর্মচারীদের রক্ষা করার দায়িত্ব, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আপনি গ্রহণ করবেন বলে আমরা মনে করি।

এই বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

রাজ্য সম্মেলনের কিছু মুহূর্ত

বুকস্টলের উদ্বোধন করছেন প্রবীর মুখার্জী

সম্মেলনের শহীদ বেদী

প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাতে হাজির কর্মচারী পরিবারের একাংশ

সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছেন কে. হেমলতা

স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের একাংশ

গণসঙ্গীত পরিবেশন করছে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম

অনুলিখন কমিটি

বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী মিছিলের একাংশ

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত।